প্রথম অধ্যায়

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর জীবন ও সাহিত্য পরিচয়

কথাসাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী বাংলা সাহিত্যে বিষয় ও আঙ্গিকের নতুনত্ব নিয়ে উপস্থিত হন। তাঁর ব্যক্তি জীবন নিয়ে তিনি বহু লেখায় নিজস্ব বিবৃতি দিয়েছে। সেই সূত্রে তাঁর জীবনযাত্রার বহু অলিগলি আমাদের সামনে রসময় ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। স্বপ্নময় চক্রবর্তী ১৯৫১সালের ২ জানুয়ারি (স্কুলের নথি অনুসারে) উত্তর কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহ কৃষ্ণকমল চক্রবর্তী পূর্ব পাকিস্তানের গুরু ট্রেনিং স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তিনি ১৯৪৭ সালের আগেই অবসর নিয়েছিলেন। পিতা হীরালাল চক্রবর্তী পূর্ব পাকিস্তানেরই স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। কিন্তু দেশভাগের সময় পছন্দ অনুযায়ী কলকাতায় চাকরি ও বাসস্থান বেছে নেন। ১৯৪৮ সালে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর সমগ্র পরিবার নোয়াখালি থেকে কলকাতায় পাড়ি দেয়। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর বাবা, কাকা, অবিবাহিতা পিসিমা, দাদু-ঠাকুমাকে নিয়ে কলকাতার বাগবাজারে আশ্রয় নেন। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায় দেশভাগের কারণে তাঁর বাবা-মায়ের বিবাহ সম্পন্ন হতে দেরি হয়। ১৯৪৭ সালে তাঁদের বিয়ে ঠিক হলেও বিয়ে সম্পন্ন হয় ১৯৪৮ সাল নাগদ। স্বপ্নময় চক্রবর্তী বাবা-মায়ের জ্যেষ্ঠ সন্তান। তাঁর ভাই-বোনের সংখ্যা ছয়। স্কুলে ভর্তির সময় তাঁর পিসেমশায় নিজের মত করে জন্মতারিখ দিয়ে ভর্তি করানোর ফলে সঠিক জন্ম তারিখ নিয়ে সংশয় রয়েছে। তিনি হিসেব করে এবং শৈশবের জন্মদিনে কিছু ঘটনা এবং ঠাকুমার কিছু কথা থেকে সিদ্ধান্ত নেন তাঁর জন্ম ১৯৫১ সালের আগস্ট মাসের জন্মাষ্টমীর দু'দিন আগে হয়েছিল। আগ্রহ সহকারে দিনটি খুঁজে বার করতে তিনি সচেষ্ট হননি। তবে ২৪ আগস্ট দিনটিকে তাঁর জন্ম তারিখ বলে অনুমান করেছেন। তাঁর পরিবার পূর্ব-বাংলার নোয়াখালি-কুমিল্লার ভাষা ও সংস্কৃতিকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন ভাবনায় ও কল্পনায়। ফলে বাল্য-কৈশোর কালে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর মনের গোপন কোণে সংস্কৃতি এবং ভাষাগত পার্থক্যের পরিচয় সঞ্চিত হতে থাকে। পরবর্তী কালে সে সব চিত্র সাহিত্যের পাতায় স্থান পায়। শৈশব এবং বাল্যের পাঠ স্বপ্নময় চক্রবর্তী পিতামহ শ্রী কৃষ্ণকমল চক্রবর্তীর কাছেই পেয়েছেন। পিতামহের কাছেই তিনি বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক শিখেছেন ক্লাস এইট-নাইন পর্যন্ত। বাগবাজারের মহারাজা কাশিমবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্কুলে পড়তেন। কিন্তু তাঁর বাবার ইচ্ছে ছিল ছেলেকে ভালো স্কুলে পড়াবার। তিনি বাগবাজারের স্কুলে নাইনে উঠেছিলেন। সেখান থেকে স্বপ্নময় চক্রবর্তীকে নিয়ে যাওয়া হল কলেজ স্ট্রিটের হেয়ার স্কুলে। সেখানে আবার তাঁকে ক্লাস

এইটে ভর্তি হতে হল। ভালো স্কুলে পড়লে ছেলে ভালো হবে— এই ভাবনা হীরালালবাবুর ছিল। কিন্তু পুত্র স্বপ্নময়ের আক্ষেপ যে— বাবা স্কুল শিক্ষক হয়েও ছাত্রের ভালোটা বুঝতে পারেননি। কারণ, স্বপ্নময় চক্রবর্তী আগের স্কুলে প্রথম চারের মধ্যে থাকলেও হেয়ার স্কুলে তিনি 'লাস্ট বেঞ্চার্স' হয়ে গেলেন। ভালো ছাত্রদের মধ্যে তিনি পাত্তা পেলেন না। তবে হেয়ার স্কুলের বাংলার শিক্ষক অসীমবাবুর নজরে পড়লেন তাঁর বাংলা রচনা লেখার গুণে। হেয়ার স্কুলে কোনোরকমে ক্লাস নাইনে সাইন্স নিতে পারলেন। এরপর যা রেজাল্ট করলেন তাতে রসায়নে অনার্স পেলেন দমদম মতিঝিল কলেজে। হেয়ার স্কুলে ভর্তি হয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিংয়ে পুরনো বই-পত্রের সঙ্গে তার পরিচয় হল। পড়ার বিষয়ের বাইরে অন্য ধরনের বই পড়ার নেশা তাঁকে পেয়ে বসল। রসায়নে বি.এসসি পাশ করার আগেই কর্মজগতে প্রবেশ করেন। রেজাল্ট বেরোতে কিছু দিন বাকি থাকলে তিনি 'উইমকো' বলে একটা দেশলাই কোম্পানিতে ইন্টারভিউ দেন। সেখানে সেলসম্যানের চাকরিটা পেয়ে যান। কিছুকাল পরে সাহিত্যানুরাগের কারণে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। বাড়ির বড় ছেলে হওয়ার ফলে ১৯৭২ সালে কর্মজগতে প্রবেশ করেন। সে চাকরির জন্য তাঁকে বিহারে যেতে হয়। বিহারে থাকাকালীন তিনি গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন। তবে ডিউটি ফাঁকি দিয়ে নালন্দা ঘুরতে যাওয়ার কারণে তাঁর চাকরিটা চলে যায়। প্রথম চাকরিতে মাইনে পেয়েছিলেন ৫০০ টাকার মত। প্রথম কর্মজীবনে মোটা অঙ্কের মাইনে পেয়ে তিনি জীবনটাকে স্বচ্ছলভাবে চালাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু চাকরিটা চলে যাওয়ায় কলকাতায় ফিরলেন। বাড়িতে চাকরি না করার কারণটি গোপন করে গিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে পেইন্ট-ভার্নিশ টেকনোলজিতে ভর্তি হন, কিন্তু পারিবারিক বিপর্যয়ের কারণে পড়াশুনোটা ছাড়তে হল। বি.সিএস পরীক্ষা দিয়ে তিনি ভূমিসংস্কার দপ্তরে 'ল্যান্ড সেটেলমেন্ট অফিসার' পদে চাকরি পান। সেই সূত্রে বহু গ্রাম-গঞ্জের জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞ হন। তবে চাকরিটি বেশিদিন করতে পারেননি। এরপর একে একে মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ, হাওয়া দপ্তরে রাডার চালনা এবং অবশেষে আকাশবাণীর ফ্লোর ম্যানেজার হিসেবে কর্মজীবন পরিচালনা করেছেন। আকাশবাণীতে চাকরি পেয়েছিলেন ১৯৭৯-সালের ডিসেম্বরে। এরপর দীর্ঘদিন আকাশবাণীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বদলি হয়েছিলেন আদিবাসী এলাকায়। সে সূত্রে আদিবাসী জনজীবনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। মাঝে দূরদর্শন কটকেও কিছুদিন চাকরি করেছেন। সেখানকার অভিজ্ঞতাও গল্প উপন্যাসে ধরা পড়েছে। আকাশবাণীতে চাকরিরত অবস্থাতেই তাঁর সাহিত্যের সঙ্গে এক গভীর সম্পর্ক স্থাপন হল। এই সময়ে মধ্যযুগ, রবীন্দ্রনাথ পড়লেন। দেশ-বিদেশের

সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটল তাঁর। সাহিত্য চর্চার জগতে প্রবেশ করলেন ঠিক ২০-২২ বছর বয়সের মধ্যে। একই সঙ্গে কর্মজগৎ ও লেখালেখির জগৎকে সামলে চলতে অভ্যস্ত হয়ে গেলেন। রিটায়ার্ড করেছেন আকাশবাণী থেকেই। তারপর কিছুদিন ইন্ডিয়ান স্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে ছিলেন। বর্তমানে কর্মজীবন ত্যাগ করে তিনি অবসর জীবনযাপন করছেন।

স্বপ্নময় চক্রবর্তী স্কুল জীবন থেকেই লেখক হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। বাংলার মানে বই হয়ে ওঠে তাঁর প্রেরণা। মানে বইতে কবিদের সম্পর্কে যে বিশেষণ ব্যবহার করা হত সেই বিশেষণগুলির প্রতি তিনি আকর্ষণ অনুভব করতেন। স্কুলে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-মধুসূদন-দ্বিজেন্দ্রলালের ছবির পাশে বঙ্কিমচন্দ্র-শরৎচন্দ্রের ছবি টাঙানো থাকত। ছবিগুলি তাঁর মধ্যে কবি বা সাহিত্যিক কিছু একটা হওয়ার প্রেরণা দিয়েছিল। স্কুল ম্যাগাজিনেই তিনি প্রথম 'গ্রীষ্মের দুপুর' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন। এরপর কবিতা লিখতে শুরু করেন নিজস্ব তাগিদে। 'সমাজ সচেতন' মূলক কবিতা লিখে তিনি খাতা ভর্তি করতে শুরু করেন। না বুঝেই কবিতা লিখে তিনি কবিতা লেখার স্বাদ অনুভব করে চলেছিলেন। তাঁর কবিতার খাতাটি ১৯৭০ সাল নাগাদ এক কবি দাদার দৌলতে হারিয়ে যায়। ইতিমধ্যে দু'-তিনটি কবিতা লিটিল ম্যাগাজিনে বের হয়। তবে সেগুলি যে কবিতা মোটেই হচ্ছে না সে সম্পর্কে তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন বলেই খাতাটি হারিয়ে যাওয়াতে সেভাবে আফসোস বোধ করেননি। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর লেখালেখিতে প্রথম আনুষ্ঠানিক হাতেখড়ি কলেজে পাঠরত অবস্থাতেই হয়। 'চতুষ্কোণ' ও 'নন্দন' পত্রিকায় কবিতাও লিখতেন। কিন্তু কবিতার চেয়ে তাঁর প্রিয় ছিল গল্প লেখা। সেই সুবাদেই ১৯৭৪ সালে 'মধ্যাহ্ন' পত্রিকায় 'যোজন বিস্তৃত' নামক গল্পের মধ্য দিয়ে তিনি ছোটগল্প জগতে বিচরণ শুরু করেন। ইতিপূর্বে তিনি স্বপন চক্রবর্তী নামে 'অমৃত' পত্রিকায় 'বাঁধানো দাঁত' এবং 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় 'ঘুঙুর' নামক গল্প লিখলেও গল্পগুলি ততটা জনপ্রিয়তা পায়নি। ১৯৭৫ সাল থেকে পড়াশুনোর সঙ্গে চাকরির চেষ্টার জন্য লেখালেখি কিছুদিন বন্ধ ছিল। এরপর ১৯৭৮ সাল থেকেই তিনি নিয়মিত লেখা চালিয়ে যান। এই সময়পর্বেই 'প্রমা', 'অনুষ্টুপ', 'সত্তর দশক' ইত্যাদি পত্রিকাগুলিতে নিয়মিত লিখতেন। 'মধ্যাহ্ন' পত্রিকায় লেখালেখির সময় সম্পাদক শৈলেন্দ্রনাথ বসুর আড্ডার টেবিলে বহু লেখক গোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচিত হন। অগ্রজদের লেখার ধরণ তাঁকে অনুপ্রাণিত করলেও গ্রামজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁকে বারবার অন্য ভাবনায় ভাবিত করে। ফলে অগ্রজদের দেখানো পথে না হেঁটে উল্টো পথেই হাঁটলেন স্বপ্নময় চক্রবর্তী। সেখানে সত্তরের উত্তাল পরিস্থিতির বস্তাপচা ছক নেই, বরং রয়েছে বিচিত্র কর্মজীবনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ।

গ্রাম জীবনের ভিন্নমাত্রার অভিজ্ঞতা স্বপ্নময় চক্রবর্তীর প্রথম পর্বের গল্পগুলির একমাত্র অবলম্বন। তাঁর প্রথম গল্প সংকলন 'ভূমিসূত্র' প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালে 'অনুষ্টুপ প্রকাশনী' থেকে। ভূমিসংস্কার দপ্তরে চাকরির সূত্রে শহর জীবনের সন্তান মাটির কাছাকাছি গেলেন। দু'চোখ ভরে দেখলেন ধানের দুধ হয়। ধান কাটার পর ফাঁকা মাঠ, ইঁদুরের গর্ত, কাদামাটি লেপে থাকা মানুষ, জমির সঙ্গে লেগে থাকা মানুষগুলিকে দেখলেন। ভূমিদাস, বর্গাদার, সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ এসব তিনি নিজের চোখে দেখলেন। দু'বছরের চাকরি জীবনে রসদ সংগ্রহ করলেন সারা জীবনের মত। সংগৃহীত রসদ নিয়েই শুরু করেন গল্প লেখা, যা 'ভূমিসূত্র' গল্পগ্রন্থ নাম নিয়ে পবিত্র সরকারের অনুপ্রেরণায় প্রকাশিত হল। বইটি প্রকাশের পর সাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় এবং হাসান আজিজুল হকের প্রশংসা লেখককে উদ্বুদ্ধ করেছে পরবর্তী সৃষ্টিতে। এরপর একে একে 'অষ্টচরণ ষোল হাঁটু' (১৯৮৬ খ্রি:), 'ভিডিও-ভগবান-নকুলদানা' (১৯৯৩ খ্রি:), 'জার্সিগরুর উল্টোবাচ্চা' (১৯৯৫খ্রি:), 'সতর্কতমূলক রূপকথা' (১৯৯৯খ্রি:), 'গিরিবালা, কৃষ্ণা আরও কয়েকজন' (২০০০খ্রি:), 'সত্যিকারের স্বপ্ন ও সনাতনের গল্প' (২০০১খ্রি:), 'চম্পক চম্পূ ও অন্যান্য গল্প', 'ফুল ছোঁয়ানো', 'শ্রেষ্ঠ গল্প' (দে'জ ২০০৩খ্রি:), 'পঞ্চাশটি গল্প' (আনন্দ ২০০৬খ্রি:), 'দশটি গল্প', 'যন্তরমন্তর', 'সেরা ৫০টি গল্প' (দে'জ), 'আমার সময় আমার গল্প', 'ব্লু সিডি ও অন্যান্য গল্প' ইত্যাদি গল্পসংকলন প্রকাশিত হতে থাকে।

সাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী লেখালেখির জগতে পদার্পণ করেই বুঝতে পেরেছিলেন সাহিত্যের গতানুগতিক ধারা থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে হবে। আলাদা হওয়ার তাগিদ তাকে জ্ঞান সঞ্চয়ের পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করে। তিনি এঙ্গেলস পড়লেন, ডারউইন পড়লেন, সঙ্গে কার্ল মার্কসও। বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়ায় তিনি সব কিছুকে বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করেন। তিনি আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করলেন। ফ্রয়েড পড়লেন সঙ্গে ইয়ুং, প্যাভলভ পড়ে তিনি নতুন ভাবে মন ও মানব জীবনকে অনুভব করতে শিখলেন। ফলে সাহিত্যিকের কাজ সম্পর্কে নিজে সিদ্ধান্ত নিলেন— যে সাহিত্যে বিশ্লেষণটাও প্রয়োজনীয়। ফলে তিনি বিশ্লেষকের দৃষ্টিতে সাহিত্য রচনা করতে শুরু করেন। ভালো লেখার তাগিদে তিনি সাহিত্যের অলিগলিতে ঢুকে গেলেন। যা এতদিন পড়া হয়নি সে সব বিষয় পড়লেন। কবিতা, উপন্যাস, গল্প, নাটক, বাংলাদেশের সাহিত্য পড়তে শুরু করেন। এক বৃহত্তর ক্যানভাস তাঁর সামনে উপস্থিত হল। শুধু অভিজ্ঞতা নয়, ক্ষেত্রসমীক্ষা প্রয়োজন ভালো লেখার জন্য। শুরু হল তথ্য সংগ্রহের অধ্যায়। আবহাওয়া দপ্তরে চাকরি করার সময় তাঁকে মেটেওরলজি নিয়ে পড়াশুনো করতে হয়েছে। যন্ত্রপাতি

নিয়ে পড়ার ফাঁকে পড়তেন সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাস। এই সময় তিনি দেখলেন মানুষের সঙ্গে যন্ত্রের যে সম্পর্ক পূর্বে ছিল তার রূপ ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়েছে। ক্রমে তা 'লাভ অ্যান্ড হেট' সম্পর্কে পর্যবসিত হয়েছে। যন্ত্র এবং মানুষের সম্পর্ক নিয়ে গল্প লিখলেন যা 'সতর্কতামূলক রূপকথা' গল্প সংকলনে স্থান পেল। একটি উপন্যাস ও লিখেছেন যা 'কম্পিউটার গেম্‌স' নামে প্রকাশিত। লেখালেখির জগতে সত্তরের দশকে নিজের পরিচয় করিয়ে দিলেও উপন্যাস লেখা শুরু করাটাও বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতেই করেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকার রমাপদ চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ হয় 'গাঙ্গেয় পত্রিকা'র সম্পাদক রমানাথ মণ্ডলের দৌলতে। আনন্দবাজারে দু'একটি গল্প প্রকাশিত হওয়ার পর রমাপদ চৌধুরী স্বপ্নময় চক্রবর্তীকে উপন্যাস লিখতে বললেন। কিন্তু স্বপ্নময় চক্রবর্তী তো আগে কখনো উপন্যাস লেখেননি, ফলে কীভাবে উপন্যাস লিখবেন? রমাপদ চৌধুরী তাঁকে বলেন— তাহলে তিনি আর কথাসাহিত্যিক হতে পারবেন না। যেমন সিনেমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরদের কেউ মনে রাখে না, তেমনি শুধু ছোটগল্প লিখলে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরদের মতো অবস্থা হবে। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৯১ সাল নাগাদ। এরপর স্বপ্নময় চক্রবর্তী শারদীয় আনন্দবাজারে প্রথম উপন্যাস লিখলেন ১৯৯২ সালে। অর্থাৎ কথাসাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ঔপন্যাসিক সত্তার বিকাশ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র হাত ধরে। তাঁর ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণায় তিনি বলেন—

> *"১৯৯২ সালে আনন্দবাজার পত্রিকা উপন্যাস লিখতে বলে। রমাপদ চৌধুরীকে সামনে থেকে দেখি। বলি, উপন্যাস তো লিখিনি ...। উনি বলেন, বিয়ে করেছেন? বলি হ্যাঁ। উনি বলেন, বিয়ে করার আগে তো বিয়ে করেননি। তবে? লিখলাম। চতুষ্পাঠী। এক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের দার্শনিক সংকটের গল্প।"*[১]

'চতুষ্পাঠী' প্রকাশিত হয় ১৯৯২ সালে। গল্পচর্চার জগতে অনেক আগে প্রবেশ করলেও উপন্যাস রচনায় সেরকম ভাবে উৎসাহ না পাওয়ায় উপন্যাস জগতে তাঁর পরিসরের ব্যাপ্তি একটু ধীর গতিতে হয়েছে। কিন্তু প্রথম উপন্যাসটির রূপায়ণ সফলতা তাঁকে উৎসাহী করে তোলে পরবর্তী উপন্যাস রচনায়। একে একে প্রকাশিত হতে থাকে— 'নবম পর্ব' (১৯৯৭খ্রি:), 'বাস্তুকথা' (১৯৯৯খ্রি:), 'কম্পিউটার গেমস' (২০০০খ্রি:), 'মহামায়া' (২০০১খ্রি:), 'চলো দুবাই' (২০০২খ্রি:), 'অবন্তীনগর' (২০০২খ্রি:), 'যে জীবন ফড়িংয়ের' (২০০৪ খ্রি:), 'নাটাদা' (২০১০খ্রি:), 'পরবাসী (২০১০খ্রি:), 'কান্তকবি' (২০১১খ্রি:),'হলদে গোলাপ' (২০১৫খ্রি:), 'ভেজা বারুদ' (২০১৬ খ্রি:), 'পাউডার কৌটার টেলিস্কোপ' (২০১৬খ্রি:), 'দুনিয়াদারি' (২০১৬খ্রি:), 'কথাবলা পুতুল' (২০১৭খ্রি:), 'শেকড় ছেঁড়া' (২০১৭খ্রি:), 'চার ডাক্তার' (২০১৭খ্রি:), 'কিছু একটা হয়ে যাবে' (২০১৯খ্রি:)

ইত্যাদি উপন্যাস গুচ্ছ। বহু পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া তাঁর প্রবন্ধগুলির সংকলিত রূপ 'কোরক' থেকে প্রকাশিত হয়েছে 'আলাপবিলাপ' নামে ২০১২ সালে। স্বপ্নময় চক্রবর্তী বেশ কিছু অনুগল্পও রচনা করেছেন, যা 'অনুগল্প সংগ্রহ' নামে ২০১৪ সালে প্রকাশিত। 'জার্মান ডায়ারি' নামে তাঁর ভ্রমণ সাহিত্য প্রকাশিত হয় অভিযান পাবলিশার্স থেকে ২০১৫ সালে। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'হলদে গোলাপ' উপন্যাস যেমন পাঠক মহলের সাড়া পেয়েছিল তেমনি তাঁর 'সাদা কাক' নামক রম্যরচনাটিও পাঠকের কাছে খুব সমাদর পায়।

লেখালেখির সুবাদে স্বপ্নময় চক্রবর্তী সাহিত্য জগতে যে আসন করে নিয়েছেন সেই সূত্রে তিনি বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ১৯৮৭ সালে 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পুরস্কার', ১৯৮৮ সালে 'শিল্প সংস্কৃতি পুরস্কার', ১৯৯৯ সালে 'গল্পমালা পুরস্কার', ১৯৯৩ সালে 'তারাশঙ্কর পুরস্কার' পেয়েছেন। 'ভারত ব্যাস' ও 'আনন্দ-স্নোসেম' নামক পুরস্কারের দ্বারাও তিনি ভূষিত হন। 'অবন্তীনগর' উপন্যাসের জন্য তিনি পান 'বঙ্কিম পুরস্কার'। বিষয় এবং আঙ্গিকগত অভিনবত্বই তাঁর পুরস্কার প্রাপ্তির পরিচায়ক। বিচিত্র কর্ম জগতের অভিজ্ঞতাই স্বপ্নময় চক্রবর্তীর গল্প লেখার পরিসরকে বর্ধিত করেছে। বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনের সুবাদে তিনি গল্পরাজ্যে সুদৃঢ় পরিচিতি তৈরি করতে পেরেছেন। কিন্তু প্রথম উপন্যাস লেখার পর পত্রপত্রিকায় পরবর্তী উপন্যাস লেখার পরিসর সেভাবে তিনি পাননি। প্রথম ঋতুপর্ণ ঘোষ তাঁকে উপন্যাস লেখার পরিসরটা দেন। ২০১২-১৩ সাল জুড়ে লিঙ্গ সমস্যা নিয়ে তিনি 'হলদে গোলাপ' উপন্যাস লিখলেন। স্বপ্নময় চক্রবর্তী মনে করেন গবেষণা এবং ক্ষেত্রসমীক্ষা ছাড়া উপন্যাস লেখার আনন্দ নেই। তাই তাঁর উপন্যাসের অলি-গলিতে ছড়িয়ে রয়েছে সেই প্রচেষ্টারই ছবি।

মানবজীবনের বর্ণাঢ্য বিস্তারের রূপকার স্বপ্নময় চক্রবর্তী প্রায় চল্লিশ বছর ধরে লিখছেন। গল্পের সংখ্যা প্রায় চারশ। দীর্ঘ সময়ের পরিসরে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর বহু জীবন অভিজ্ঞতা, শৈশব ও কৈশোরের আত্মসমীক্ষা তাঁকে সমৃদ্ধ করেছে। স্বপ্নময় চক্রবর্তী গল্পের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলেছেন—

> *"গল্প কোন ঘটনার ধারাবিবরণীও নয়। ঘটনাটি হল সে ধুলোর কণিকাটি, যাকে কেন্দ্র করেই বাষ্প ঘনীভূত হয়, বৃষ্টিফোঁটা তৈরি হয়। কিংবা বাস্তবের ঘটনাটি হল সেই শূককীট, গুটি পোকার মতন থাকে। ভালবাসা ওকে প্রজাপতি করে। অথবা ছোট্ট কুঁড়িটি, যা গল্পে ইচ্ছে-কুসুম হয়ে ফুটে ওঠে। আমার গল্প মানে সেই ইচ্ছে-কুসুম ফোটানো।"*[২]

আসলে সাহিত্যিকারকে বিচিত্র অভিজ্ঞতা রসদ যোগায় পাতাবন্দি হওয়ার জন্য। একদিকে বাস্তব

অভিজ্ঞতা অন্যদিকে বিশ্লেষণী মানসিকতা স্বপ্নময় চক্রবর্তীর লেখনীকে সমৃদ্ধ করেছে। চারপাশে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলিকে বিচক্ষণতার দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করায়, তাঁর গল্পে এসে হাজির হয়েছে কল্পবিজ্ঞানও। আসলে বাস্তবতাকে প্রলেপ না লাগিয়ে তিনি যেমন হাজির করেছেন তেমনি কল্পনাকেও আবিষ্কার করতে পেরেছেন। ফলে এক বিশাল পরিসর জুড়ে কল্পবিজ্ঞানমূলক গল্পেরা উঠে এসেছে তাঁর হাতে। গল্পের দেহে যেভাবে বহু কর্ম-অভিজ্ঞতার ছাপ এসেছে সে সম্পর্কে তিনি উল্লেখ করেছেন—

> *"প্রথম দিকের গল্পে ভূমি, ভূমির সঙ্গে জড়িত মানুষদের কথাই বলেছিলাম। যাকে বলে মা-মাটি-মানুষ। কিন্তু এই শব্দ তিনটের গায়ে এত বেশি পানের রাজনৈতিক পিক পড়েছে যে, আজকাল ব্যবহার করতে ইচ্ছে করে না। পরবর্তীকালে মফঃসলের জীবনযাপন এবং শহর কলকাতার জটিলতার কথা লিখতে চেষ্টা করেছি। মানুষের সঙ্গে পরিবেশ, প্রকৃতি এবং প্রযুক্তি সম্পর্কের আলো-আঁধারি নিয়েও লেখার চেষ্টা করেছি। যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের যে একটি জটিল লাভ অ্যাণ্ড হেট সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে। এ নিয়েও লেখার চেষ্টা করেছি। বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গিক নিয়েও পরীক্ষা করতে হয়েছে, আর এসব করতে করতে বেশ ভালোই তো কেটে গেল।'"*[৩]

বহু বিচিত্র কর্ম-অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ তাঁর গল্প-উপন্যাসে রাজনীতির হালহকিকত, আধুনিক নারীর জীবন সংগ্রাম, ধর্মের নামে নানা বেশাতি উপাদান রূপে প্রবেশ করেছে। এর সঙ্গে বিজ্ঞান প্রসঙ্গ গল্প-উপন্যাসগুলিকে দিয়েছে নতুন মাত্রা। স্বপ্নময় মানুষকে ভালোবাসেন, তাই নিজের মতো করে ধরতে চান বিশ্বের সংকটকে।

সাহিত্যিক হিসেবে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর উচ্চাশা নেই। তিনি এক সতর্ক পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় যা দেখেন তা অন্যকেও দেখাতে চান। তাই দেশীয় ভূমি থেকে যা পান তাতেই যোগ করেন সামান্য হাসির খোরাক, একটু লোকগীত, একটু কথকতা, আর কখনো বা ছড়া-পাঁচালি। এর সঙ্গে দেখা যায় মানব-আত্মার রূপ-রসকে আত্মসাৎ করার প্রয়াস। এই প্রয়াসেরই প্রমাণ পাওয়া যায় গ্রাম-নগরের আলোকবৃত্ত কেন্দ্রিক গল্প, মুখ্যত 'ভূমিসূত্র'-এর গল্পগুলিতে। জীবন নির্বাহের নতুন নতুন পন্থা এবং জীবিকা নির্বাহের বহু সমস্যা 'রক্ত', 'জনৈক লিট্‌ল ম্যাগাজিন সম্পাদক', 'ভর' ইত্যাদি গল্পে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তাঁর গল্পে শোনা গেছে প্রচলিত ধর্মসংস্কারের উর্ধ্বে জীবনের জয়গান, যেমন— 'রাধাকৃষ্ণ', 'ধর্ম', 'দীন-ইলাহী'। রাজনীতির হালহকিকতের গল্প—'রামযতনের

বাগান', 'সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের পরে', '১১ই সেপ্টেম্বর' ইত্যাদি। যন্ত্রের ভয়ঙ্কর ও সুন্দর রূপ নিয়ে লিখেছেন— 'রাক্ষসায়ন', 'মোবাইল সোনা', 'যন্ত্রপাতি' ইত্যাদি গল্প।

আকাশবাণীর সঙ্গে কর্মসূত্রে বহু জায়গায় বদলি তাঁর অভিজ্ঞতাকে পরিপুষ্টি দান করেছে। আকাশবাণীতে প্রযোজক হিসেবে কাজ করার সময় 'সন্ধিক্ষণ' নামে যৌনশিক্ষার একটি ধারাবাহিক তিনি সম্প্রচার করেন। অনুষ্ঠানটি ১৯৯৬-৯৭ সালে ৫৫ মিনিট ব্যাপী সম্প্রচার হত। পরবর্তীকালে শ্রোতাদের অনুরোধে ২০০০ সালে পুনঃসম্প্রচার করা হয়। এই সময়ের যৌনতা সম্পর্কীয় কিছু ঘটনা তাঁর গল্প ও উপন্যাসের বিষয়বস্তু হয়েছে—

> *"কয়েক বছর আগে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ঘটনাটি ঘটেছিল বাঁকুড়ায়। একটি মেয়েকে টুকরো টুকরো করে কেটে একটা বাক্সয় ঢুকিয়ে সেই বাক্সটিকে একটা জঙ্গলে ফেলে আসা হয়েছিল। ময়না তদন্তে জানা গিয়েছিল মেয়েটি গর্ভবতী ছিল। পরে আরও জানা যায় মেয়েটির স্তনের গড়ন ভালো ছিল না। সে একটি বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হয়ে স্তনের আয়তন বাড়াবার জন্য একটি মালিশ কিনতে একটি ওষুধের দোকানে যায়। ওই ওষুধের দোকানের মালিক মেয়েটিকে জানায় এই মালিশ নিজে নিজে করলে কাজ হয় না। অন্যকে দিয়ে মালিশ করাতে হয়। কথার মার প্যাঁচে মালিশ করার দায়িত্ব ওই দোকান মালিকটিই নিয়ে নেয়। ব্যাপারটা শুধু মালিশেই সীমাবদ্ধ থাকে না। মেয়েটি গর্ভবতী হয়ে পড়ে। মেয়েটি ভয় পায়। দোকান মালিক বলে গর্ভপাত এখন কোনও ব্যাপার নয়। খুবই সোজা ব্যাপার। একটি কোয়াক ডাক্তারের শরণাপন্ন হন। ছোট জায়গা, মেয়েটি লোক জানাজানির ভয়ে ডাক্তারের চেম্বারে গিয়ে গর্ভপাত করাতে চায় না। তাই এক দোকান বন্ধের দিন দোকান ঘরের ভিতরে এই গর্ভপাতটি সংঘটিত হয়। যে পদ্ধতিতে জরায়ু থেকে ভ্রূণটিকে চেঁচে বার করা হয়েছিল তাতে বিপদের সম্ভাবনা থাকে। এক্ষেত্রে জরায়ুতে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল এবং ভিতরে প্রচুর রক্তপাত ঘটেছিল। ওই বন্ধ দোকান ঘরে রক্ত দেবার ব্যবস্থা ছিল না। ফলে মেয়েটি মারা যায়। তারপর বাক্সবন্দি করে মৃতদেহ লোপাট করার চেষ্টা করা হয়।"*[৪]

'যে মেয়েটি মোহময়ী হতে চেয়েছিল' গল্পে এবং 'চলো দুবাই' উপন্যাসে উপরিউক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতটি দু'জায়গায় দু'রকম প্লটে উপস্থাপন করেছেন স্বপ্নময় চক্রবর্তী। আসলে স্বপ্নময় চক্রবর্তী

সমাজকর্মী। ফলে মেয়েটির মৃত্যুর বাস্তব অভিজ্ঞতাকে তিনি এড়িয়ে যেতে পারেননি। আসলে এ ধরনের মৃত্যুর পেছনের ভ্রান্ত ধারণাগুলিকে দায়ী করেই তিনি গল্প-উপন্যাসের প্লট নির্মাণ করেছেন। স্বপ্নময় চক্রবর্তী নিজের গল্প নির্মাণের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 'হুলো' গল্পটির পেছনে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে রূপ দিয়েছেন—

"আমি একটি গল্প লিখতে শুরু করি। গল্পের বিধুভূষণ চক্রবর্তী আমার জ্যাঠামশাই। তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে আমি 'বাগু'র আশ্রমে যাই। আমি যাবার পরই শ্মশানযাত্রা হয়, আমিই মুখাগ্নি করি। তখনই মনে হয় এত সামনে থেকে ওঁকে আগে কখনও দেখিনি। দাহকার্য সমাধা হলে অগ্নিময় চিতাবশেষ শেষে অস্থির সঙ্গে মিশে থাকে দুটি উত্তপ্ত বুলেট।

যেটা জ্যাঠামশাই শরীরে ধারণ করে রেখেছিলেন এতদিন। ওই বুলেট দুটি আমি বাড়ি নিয়ে আসি। আমার বালকপুত্রকে দেখাই, আমার বালকপুত্র কোনদিন ফ্রিডম ফাইটার দেখেনি, কিন্তু হিস্ট্রি অব ফ্রিডম স্ট্রাগল মুখস্থ করতে হয়। ওকে আমি স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন উপহার দিই। উপহার দিই ইতিহাস।

... ...

বুলেটটা আমার ঘরেই থাকে। আমার ছেলে ওটাকে একটা সুন্দর পাত্রে রেখে দেয়। ওটার দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে জয় হিন্দ বলে ওঠে। তাতে আমার অস্বস্তি হয়। ... আমি ওটাকে গঙ্গায় বিসর্জন দেবার কথা ভাবি। আমার মনোভাব কীভাবে যেন আমার পুত্রটি জানতে পারে। ও ওই পাত্রটি সরিয়ে রাখে, লুকিয়ে রাখে, যেভাবে হুলো বেড়ালের ভয়ে বেড়াল মা লুকিয়ে রাখে তার সন্তানদের। গল্পটার নাম দিই 'হুলো'।"[৫]

এভাবেই তিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে তার কথাসাহিত্যে স্থান করে দেন। সাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর দ্বৈত সত্তা। একদিকে তিনি গল্পকার, অন্যদিকে ঔপন্যাসিক। ঔপন্যাসিক সত্তার জাগরণ কিছু পরে। ফলে গল্প-উপন্যাস লেখায় তাঁর কিছু অভিজ্ঞতার আদান প্রদান ঘটেছে উভয় ক্ষেত্রে। আকাশবাণীতে কর্মসূত্রে তাঁর অভিজ্ঞতা 'বাতিল রেকর্ড' গল্পে উঠে এসেছে। গ্রামে গ্রামে ঘোরার সূত্রে 'ভূমিসূত্র' এবং 'অষ্টচরণ ষোল হাঁটু' গল্প সংকলনগুলিতে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর অভিজ্ঞতা পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যায়। 'রত্নাকরের পাপের ভাগ' গল্পটিতে গ্রামীণ জীবনের চিত্রের সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের চিত্রও ফুটে উঠেছে। 'কল', 'রক্ত', 'সর্ষে-ছোলা-ময়দা-আটা', 'ভর', 'ভালো করে পড়গা ইশ্‌কুলে'

ইত্যাদি গল্পে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার চিত্রকে তুলে ধরার কথা বহু আলাপচারিতায় ফুটে উঠেছে। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'ঝড়ের পাতা' নামক গল্পটি নিয়ে সিনেমা তৈরি হয়েছে। সিনেমাটির প্রযোজনায় 'নিউ থিয়েটার্স', পরিচালনায় সোমনাথ গুপ্ত। সিনেমাটি মুক্তি পায় ২০১১ সালে। সিনেমাটির এডিটর ছিলেন অর্ঘ্যকমল মিত্র। নাম দেওয়া হয় 'আমি আদু'। সিনেমাটি যথাক্রমে 'Best Feature Film in Bengali' এবং 'National Film Award' পুরস্কারে ভূষিত হয়। গল্পটির পটভূমি এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে একটি বৃহত্তর সমস্যাকে তুলে ধরেছেন স্বপ্নময় চক্রবর্তী।

স্বপ্নময় চক্রবর্তীকে আশির দশকের গল্পকার বলা হয়। ১৯৭৭-৭৮ সাল থেকে তিনি লেখার ক্রম রক্ষা করলেও ১৯৮২ সালে তাঁর প্রথম গল্পসংকলন 'ভূমিসূত্র' প্রকাশিত। এই সময়ের লেখায় সত্তরের চেনা ছক, রাজনৈতিক বাঁধাধরা গতিবিধি, শ্রেণি শোষণের করুণ যন্ত্রণার ছবি নেই, যা আছে সেটি হল সমাজের অবক্ষয়ের রূপ, সুবিধাবাদীদের নির্মমতা, মাটি-মানুষের ছবি আঁকা, আধুনিক নাগরিক জীবনের নানা সমস্যা ও সংকট আর মানুষের নৈতিক অবনমনের কাহিনি। স্বপ্নময়ের সমসাময়িক বহু গল্পকার এসময় সাহিত্যের বাতায়নে স্ব-গর্বে প্রতিষ্ঠিত। যেমন— আশির দশকে আবুল বাশার, যিনি গল্প লিখছেন মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের দরিদ্র মানুষদের নিয়ে, বেছে নিয়েছেন ভারতবর্ষের বৃহত্তর সংস্কারবদ্ধ পটভূমি। যেখানে হিন্দু ও মুসলিম সমাজের ভেদাভেদ এবং মানবিকতা একটি অস্তিত্বের অন্বেষণ করে।

আশির দশকে দুই শক্তিশালী লেখিকা বাণী বসু ও সুচিত্রা ভট্টাচার্য। প্রথম জন গল্পে নিয়ে এলেন মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারের গভীর সমস্যা সংকটের মধ্য দিয়ে চলমান জীবনের চিত্রকে। আর দ্বিতীয়জন নিয়ে এলেন পুরুষ শাসিত সমাজে শোষিত নারীর চিত্র, নিয়ে এলেন ধর্ষিতা নারীদের কাহিনি এবং মধ্যবিত্তের সংকটময় জীবন বৃত্তান্তকে।

এই প্রসঙ্গে আফসার আহমেদের কথা উঠে আসে, যিনি এই আশির দশকে মানব সমাজের অভাব-অভিযোগ, নিরাপত্তাহীনতার বহু মর্মস্পর্শী গল্প লিখছেন। আশির দশকের কথাকার স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ছোটগল্প রচনার প্রবৃত্তি তাঁর জীবনের বহুবিচিত্র মানুষ ও তাদের জীবনকে পর্যবেক্ষণের ফল। সাহিত্যাকাশে বিচরণ কালে স্বপ্নময় কোনো অগ্রজ গুরুভাইদের ছত্রছায়ায় থাকতে চাননি বা তিনি সেরকম কারুর শিষ্যও হয়ে ওঠেননি। তিনি হেঁটেছেন আপন মর্জির মালিক হয়ে। তবে সাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর কিছুটা অন্যধরনের সম্পর্ক ছিল, সেখানেই যতটুকু ছত্রছায়া পেয়েছেন সেই সূত্রে তিনি বলেছেন—

"শ্যামলদার বাড়িতে, মানে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে মাঝেমাঝে আড্ডা

দিতে গিয়ে শিক্ষিত হয়েছি। বড়োমানুষদের বাড়ি বলতে একমাত্র ওঁর বাড়িতেই গিয়েছি কয়েকবার। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ির আড্ডায় মাত্র দু-দিন গিয়েছি; শঙ্খ ঘোষের বাড়ির রবিবারের আড্ডায় যাইনি, ভয় করে। ওখানে গুণীজনের সংখ্যা বড়ো বেশি।'[৬]

স্বপ্নময় চক্রবর্তীকে বলা যায় একজন সাহসী লেখক। কারণ তাঁর প্রথম পর্বের গল্পগুলি থেকেই তিনি নির্ভীকভাবে সদ্য ঘটে যাওয়া সমাজের ঘৃণধরা বিষয়গুলিকে নিয়ে গল্প লিখেছেন। তবে গ্রামের মানুষগুলির প্রতি সহানুভূতি তাঁর গল্পের কাহিনী নির্মাণে অনেকটা সাহায্য করেছে। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের বড় হওয়া স্বপ্নময় চক্রবর্তী সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বহু জটিল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেছেন। বাবার সঙ্গে বাল্যকালে ধর্মতলার রাস্তায় হাঁটার সময় লক্ষ করেছেন— 'এ আজাদী ঝুটা হ্যাঁয়'-র মতো শ্লোগান। দেখেছেন চিনের সঙ্গে যুদ্ধ। লক্ষ করেছেন রাজনীতির বহিরঙ্গ আচ্ছাদনের আড়ালে ঘৃণ্য রূপকে। দেখেছেন সমাজ বদলের বিপ্লবীদের, গ্রাম দিয়ে নগরকে ঘেরার শ্লোগান শুনেছেন, শুনেছেন 'সত্তরের দশক মুক্তির দশক'। এই আদর্শবাণী-দৃশ্য তাঁর সমগ্র মন গঠনে অনেকটা সাহায্য করেছিল। এছাড়া তাঁর আশেপাশের মানুষজনের মধ্যে গরীব, নিঃস্ব, বোকা মানুষগুলিকে দেখে তাঁর বিবেক জাগ্রত হয়; তাই তাঁর হাত দিয়ে বেরিয়ে আসে জীবনের সংগ্রামরত মানুষগুলির কথা। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর গল্পের প্রতিবেদন সম্পর্কে তপোধীর ভট্টাচার্যের উক্তিটি গ্রহণযোগ্য—

"কথকতার যে-সব সহজ পরম্পরাকে আধুনিকতাবাদ চরম ঔদ্ধত্যে মুছে দিতে চেয়েছিল, স্বপ্নময় ফিরে ফিরে যান তার কাছেই; ফিরিয়ে আনেন লোকশ্রুতি ও লোকায়ত বাচনের কত বিচিত্র অনুষঙ্গ। তাঁর কথা চয়নে সমকাল ধরা পড়ে তার অন্তর্বৃত্ত শ্লেষ ও কারুণ্য, বিষাদ ও স্ববিরোধিতা, তিক্ততা ও যন্ত্রণা, লোভ ও প্রতিবাদ, সমস্ত কিছু নিয়ে, এককথায়, তার বহু রৈখিকতায়। স্বপ্নময়ের গল্পের ভুবন এই জন্যে বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। তিনি যেমন প্রমাণ করে দিয়েছেন যে খাঁটি গল্পকারকে 'বিষয়' নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামাতে হয় না, যে কোন কিছুই তাঁর গল্পের অবলম্বন হতে পারে।"[৭]

একথা সত্যি যে স্বপ্নময়ের গল্পের ভুবন এত বিচিত্র যে তাঁর প্রতিটি গল্পই একে অপরের থেকে ভিন্ন, কোন গল্পের থিম বা প্লটের পুনরাবৃত্তি নেই। তাঁর গল্পে দেখা যায় মানুষের মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে থাকা দ্বিতীয় মানুষটিকে। ঔপনিবেশিকতাবাদের উত্তরপর্বে মানুষের মূল্যবোধের যে তীব্র

দ্বন্দ্ব, সেই দ্বন্দ্বকেই দেখান স্বপ্নময় চক্রবর্তী। রহস্যময় মানবজীবনকে সৃষ্টি সুখের উল্লাসে বিলীন করে দিতে চান তিনি। এই বিলীয়মান নিশ্চিহ্নতা থেকে যে কঠিন কঠোর সত্যের সৃষ্টি হয়। সেই সত্যকে তুলে ধরাই গল্পকার স্বপ্নময় চক্রবর্তীর কাজ।

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর প্রথম উপন্যাস 'চতুষ্পাঠী'তে তিনি অনন্দমোহন চরিত্রের মধ্য দিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে জড়িত চরিত্রের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। বাঙালি জাতির শ্লীলতা-অশ্লীলতা বিষয়ে দ্বন্দ্ব রয়েছে। সে প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কথা বলেছেন। 'চতুষ্পাঠী' উপন্যাসে সে ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। বিষয়টি সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

> *"দাদুর উত্তরাধিকার ছিল সংস্কৃত সাহিত্য, এবং গত শতাব্দীর মূল্যবোধ। এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার কথা বলি। এই প্রসঙ্গটা আমার 'চতুষ্পাঠী' উপন্যাসে কিছুটা রয়েছে। আমি অল্প কিছুদিন একটি টোলে সামান্য সংস্কৃত শিক্ষা করি। সন্ধিবৃত্তি নামক একটি বই আছে, পাণিনি ব্যাকরণের অংশ। আমি তখন নবম বা দশম শ্রেণির ছাত্র। যাঁর টোল, সেই পণ্ডিতমশাই ছিলেন কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ। আমার ঠাকুমার সম্পর্কিত ভাই। সে অর্থে আমারও দাদু।"*[৯]

এই দাদুই যেন 'চতুষ্পাঠী' উপন্যাসের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের ছায়া। আবার লেখকের নিজের পিতামহের সংস্কৃতজ্ঞ মানসিকতা উক্ত উপন্যাসের পটভূমি রচনার ক্ষেত্রে এবং তাঁর ব্যক্তিগত কর্মজীবনের গবেষণাধর্মী মানসিকতা কাজ করেছে। পরবর্তীকালে 'সন্ধিক্ষণ' নামে একটি অনুষ্ঠান চলাকালীন যে যে চিঠি তাঁর কাছে এসেছে সে সব চিঠিগুলির ভাবনা তাঁকে 'হলদে গোলাপ' উপন্যাসে পটভূমি তৈরি করে দিয়েছে। অন্যান্য উপন্যাসগুলির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

আমাদের চারপাশটা প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে। বদলে যাওয়া পৃথিবীটার রূপ ক'জন ব্যক্তি বিচার করে বলতে পারেন ? কিন্তু স্বপ্নময় চক্রবর্তীর চোখে রয়েছে বৃহত্তর সমাজ পরিবেশের রূপ। সমাজ, সময়, পরিবেশের প্রতিনিয়ত বদলে যাওয়া রূপের ছোঁওয়া তাঁর সাহিত্যে যত্রতত্র। তিনি এক উত্তাল সময়পর্বে বড় হয়েছেন। সেই সময়পর্বের বহু ঘটনা তিনি নিরপেক্ষভাবে বোঝার চেষ্টা করেছেন। বিশেষ করে, রাজনৈতিক পালাবদলের ইতিহাস তাঁর সাহিত্যের প্রকোষ্ঠে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'চতুষ্পাঠী'তে দার্শনিক বোধের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক-সামাজিক চিত্রকেও স্পষ্ট করেছেন। 'কান্তকবি', 'যে জীবন ফড়িংয়ের', 'ভেজাবারুদ' উপন্যাসগুলিতে রাজনৈতিক পরিমণ্ডল বহুভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর নিজস্ব অভিজ্ঞতা বহুলভাবে প্রযোজ্য, উপন্যাসের বহু অংশে। যৌবনকালে চারপাশে কংগ্রেসি এবং কমিউনিস্টদের দেখে তিনিও

অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাই রাজনৈতিক পালাবদলে সামাজিক পরিবর্তনের অলিগলি তাঁর কাছে স্পষ্ট। এ যুগের রাজনৈতিক দলের তর্জাকে তিনি যুগবদলের ইঙ্গিত হিসেবে উপন্যাস মধ্যে বহু জায়গায় স্থান দেন। সর্বোপরি এই সত্যে তিনি উপনীত হন রাজনৈতিক বাঁকবদলে দেশের পরিবর্তন সাধিত হয় সর্বত্র। আবার তার রূপও পরিবর্তিত হয়। তিনি স্বাধীনতা নিয়ে সত্তর-আশির দশকে বহু অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু সেই অভিজ্ঞতার সঙ্গে বর্তমানে অমিলটা তিনি লক্ষ্য করেছেন—

> *" স্বাধীনতা কী আমরা প্রকৃত জানি না, আমার এই প্রজন্মও জানে না। আমি যে অঞ্চলে এখন থাকি, একদা রিফিউজিরা কলোনি গড়ে তুলেছিলেন সেখানে। একটি নতুন দোকান হয়েছে দেখলাম। বড়ো বড়ো করে লেখা— 'স্বাধীনতা'। তার তলায় অপেক্ষাকৃত ছোট অক্ষরে— 'এলাকার মেয়েদের নিজস্ব বিউটি পার্লার'।"*[৯]

বয়ে যাওয়া সময়ের মূল্যবোধের অবক্ষয় স্বপ্নময় চক্রবর্তীকে বারবার ভাবিয়েছে। ফলে তিনি ফিরে ফিরে যান প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহের দিকে। ফলে সময়-সমাজ-ইতিহাসের একটা বড়ো অংশ তাঁর লেখায় আমরা লক্ষ করি। তিনি যে সময়কালে যৌবন অতিবাহিত করেছেন, সে সময়কাল চরম উত্তেজনাপূর্ণকাল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। তিনি দেখেছেন দেওয়াল লিখন— 'মন্ত্রীবদল মানে সমাজ বদল নয়', 'গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা', 'সত্তর দশক মুক্তির দশক', 'চিনের চেয়ারম্যান আমাদের ম্যান'। ফলে এই সময়ের শিহরণকে তিনি অস্বীকার করেননি। বর্তমান প্রজন্মের গ্লোবালাইজেশনের প্রভাবে নিজস্ব সংস্কৃতিও প্রাচীন ইতিহাসকে অস্বীকার করা তিনি লক্ষ করেছেন। তার সঙ্গে এর পরিণামের ইতিহাস তিনি অবলোকন করেন খুব কাছ থেকেই।

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর আর একটি বিষয়ের প্রতি নজর রয়েছে, বা বলা যেতে পারে তার কৌতূহল আছে। যার বৃহৎ ফলশ্রুতি 'হলদে গোলাপ' উপন্যাস। অর্থাৎ সমাজের তথাকথিত তৃতীয় লিঙ্গ সম্পর্কিত বিষয়ের প্রতি তাঁর সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টি ছিল প্রথম থেকেই। চলমান সময়ের গতিপথে সেই মানুষগুলির হালহকিকত সম্পর্কে তিনি সজাগ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন বহুদিন ধরে। তার প্রভাব আগে ও পরের বহু লেখায় লক্ষ করা গেলেও 'হলদে গোলাপ' তাঁর বৃহৎ সৃষ্টি। আসলে সমাজের তৃতীয় লিঙ্গ নিয়ে তাঁর একটা ঝোঁক ছিল। বিভিন্ন জায়গা থেকে পড়াশুনো করে বা সুযোগ পেলেই আলাপ আলোচনা বা মেলামেশা করে তিনি জানার এবং বোঝার চেষ্টা করেছেন। যার ফলশ্রুতি ভারতবর্ষের প্রথম ডকুমেন্টারি উপন্যাস 'হলদে গোলাপ'। 'চন্দ্রগ্রহণ' পত্রিকায় স্বপ্নময়

চক্রবর্তীর একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশ হয়েছিল। সেখানে সম্পাদকের প্রশ্নের জবাবে তিনি যে মন্তব্য করেন তাতেই তাঁর মানসিকতার আঁচ কিছুটা করা যায়—

> *"আমার যেটা ইন্টারেস্ট ছিল। সেটা প্রথমে এ্যাকাডেমিক ইন্টারেস্ট হয়। যে তৃতীয় লিঙ্গ কথাটি আমরা বলছি সেটা ঠিক লিঙ্গ নির্ধারক অভিধা নয়। তৃতীয় লিঙ্গ বলে যে কিছু হয় সেটাও নয়। একজন মানুষের যে লিঙ্গ পরিচয় তার দুটো ভাগ আছে। একটা হচ্ছে সিস জেন্ডার এর মানে হচ্ছে ইচ্ছে দেহে মনে যে একই লিঙ্গ অবস্থান করে। ধরুন আপনি পুরুষ আমি পুরুষ, মনে এবং শরীরে যদি এরকম হয়ে থাকে তাহলে আমরা সিস জেন্ডার। আর যদি ব্যতিক্রম হয় তাহলে সিস জেন্ডার নয় আমরা। কখনও বলা হয় তারা ট্রান্সসেক্সুয়াল, এরকম একটু ব্যতিক্রম থাকলেই, যারা বিশেষজ্ঞ, তারা বিভিন্ন নাম দিয়েছে এবং সামগ্রিকভাবে আমরা যে তৃতীয় লিঙ্গ বলছি, বাস্তবে নারী বা পুরুষ ছাড়া ক্লীবলিঙ্গ বলে কিছু হয় না।"*[১০]

গভীর সহমর্মিতা এবং সচেতনাবোধ স্বপ্নময় চক্রবর্তীকে তৃতীয় লিঙ্গ বিষয়ে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। এর সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিমানুষের যৌনজীবন সম্পর্কেও তাঁর একটা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। শুধু 'হলদে গোলাপ' উপন্যাসেই নয় অন্যান্য উপন্যাসেও স্বপ্নময় চক্রবর্তী যৌনতার বিভিন্ন রূপভেদকে তুলে ধরেছেন। আসলে প্রকৃতির মধ্যে মানব-মানবী নিজস্বধারায় আচরণ করে। কিন্তু এমন অনেক আচরণ দেখা যায় যা নিয়ম মেনে চলে না। স্বপ্নময় চক্রবর্তী সেই সব হীন আচরণের প্রতি তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বোঝার চেষ্টা করেন এই ধরনের আচরণের কারণ। স্বপ্নময় চক্রবর্তী মনে করেন কিশোর কিশোরীদের সঠিক বিজ্ঞানসম্মত যৌন শিক্ষার প্রয়োজন। তিনি 'সন্ধিক্ষণ' নামে বেতারে যৌনশিক্ষা বিষয়ে একটি অনুষ্ঠানও চালু করেন। বেশ সাড়াও পান শ্রোতাদের কাছ থেকে। ভারতীয় জীবনযাত্রায় যৌনতাকে নিয়ে ছুতমার্গ রয়েছে। ফলে গোপন যৌনকর্মের মতো ঘৃণ্য কর্ম এখানে যত্রতত্র। শরীরকে বর্তমানে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এসবের জন্য স্বপ্নময় চক্রবর্তী চিন্তিত। তিনি চান সুস্থ যৌনতাবোধ গড়ে উঠুক। তাতে সমাজের গতিধারা বিপন্নতাবোধ করবে না। সমাজের বহু ব্যাধি এতে সেরে উঠবে। তিনি 'হলদে গোলাপ' ছাড়াও 'চলো দুবাই', 'কম্পিউটার গেমস', 'যে জীবন ফড়িংয়ের', 'অবন্তীনগর', 'ভেজাবারুদ', 'কথাবলা পুতুল' উপন্যাসগুলিতে যৌনতা নিয়ে সমাজের বাড়বাড়ন্ত রূপকে তুলে ধরেছেন— কথা বলেছেন যেটা না বললেই নয়—

> *"বিধবাদের পুনর্বিবাহ দেবার কথা বিদ্যাসাগর ভেবেছিলেন সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যাসাগরের সঠিক যৌনবোধ ছিল বলেই। আজ অনেক বধূ*

নির্যাতন, অনেক ডিপ্রেশন, অনেক আত্মহত্যার কারণ সঠিক যৌনতাবোধের অভাব। ব্যবসা ধান্ধা বিযুক্ত দেশোপযোগী বৈজ্ঞানিক যৌনশিক্ষাই কুসংস্কার বিরোধী নির্মল মনের জন্ম দিতে পারে।'"[১১]

আগ্রহ মানুষকে বহুমুখী করে তোলে। স্বপ্নময় চক্রবর্তী সম্পর্কে সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। ভুললে চলবে না তিনি রসায়নের ছাত্র। ফলে বিজ্ঞানের অলিগলির খবর তার কাছে। কম্পিউটারের প্রভাব বর্তমানের প্রজন্মকে নিয়ন্ত্রণ করে। তার সঙ্গে ইন্টারনেট মানবজগতের সামনে গোটা বিশ্বকে হাজির করে। ফলে মানুষের কাছে চাহিদা অনেক বেশি গুরুত্ব পায়, মূল্যবোধ নয়। বিজ্ঞানের জয়যাত্রার প্রয়োজনীয়তা আমাদের সমাজে ছিল কিন্তু সেই জয়যাত্রা সমস্ত সুকুমার বৃত্তিগুলিকে ধ্বংস করে নয়। ভুল ভাবে বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকগুলিকে ব্যবহার করার ফলে জীবনের বিচিত্র অবক্ষয় স্বপ্নময় চক্রবর্তী লক্ষ করেছেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয়ের প্রতি তার সূক্ষ্মদৃষ্টি ছিল। তিনি বর্তমানের চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানব সমাজের জ্ঞানান্ধতাকেও দেখাতে ভোলেননি। ভারতীয় মন বিজ্ঞানকে হাতের কাছে এনে দিলেও সংস্কারাচ্ছন্ন মন বিজ্ঞানের জয়যাত্রাকে সাদরে গ্রহণ করতে পারে না। চিকিৎসা বিজ্ঞানে তার বড়ো ধরনের প্রমাণ পাওয়া যায়। 'চার ডাক্তার', 'কিছু একটা হয়ে যাবে' উপন্যাসের মধ্যে এই উদাহরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ধর্মবিশ্বাস নিয়েও স্বপ্নময় চক্রবর্তীর এক আলাদা ভাবনা রয়েছে। তাঁর বহু ছোটগল্পে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। উপন্যাস মধ্যে 'দুনিয়াদারি' বড়ো ধরনের উদাহরণ। তবে এই উপন্যাসে তিনি ইসলামধর্মের এক ব্যক্তির মানবতার প্রতীক হয়ে ওঠাকে দেখিয়েছেন। হিন্দু ধর্মের মধ্যে যে সংস্কারবোধ রয়েছে তা তুলে ধরতে তিনি পিছপা হননি কোনো লেখাতেই। ধর্মকে নিয়ে ব্যবসার আঁচ কিছুটা 'ভেজাবারুদ' উপন্যাসেও দেখা যায়। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা বাংলায় বসবাস করার ফলে ধর্মান্তরিত বাঙালি মুসলমানরা এক অন্য ধরনের মিশ্র সংস্কৃতিকে ধারণ করে জীবন-যাপন করে। খাদ্যাভ্যাস তার একটি বড়ো উদাহরণ। 'দুনিয়াদারি' উপন্যাসে সে চিত্র রয়েছে।

বাঙালির রান্নাবান্না সম্পর্কে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর অভিজ্ঞতা এবং জানার ইচ্ছে এক অন্যমাত্রা দান করেছে তাঁর জ্ঞানভাণ্ডারে। 'গিন্নি যখন বাপের বাড়ি' বলে উত্তরবঙ্গ সংবাদে রবিবারের কাগজে তিনি একটি রম্য রচনা লিখেছেন। পারিবারিক পরিমণ্ডল থেকে তাঁর রান্নার সুখ্যাতি সম্পর্কে জানা যায়। তাঁর বেশ কয়েকটি উপন্যাসে রান্নাবান্নার পদ্ধতি, উপকরণ নিয়ে বেশ মননধর্মী ভাবনার প্রকাশ রয়েছে। স্বপ্নময় চক্রবর্তী বাণী দেবীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ সালে। তঁদের পুত্র সন্তান ধ্রুব বর্তমানে তিরিশোর্ধ এবং ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে বেসরকারি সংস্থায়

কর্মরত। লেখালেখির সঙ্গেও যুক্ত রয়েছেন। ব্যক্তিগত পরিসরের কাহিনি স্বপ্নময় চক্রবর্তীর সাহিত্যের পাতায় বহু জায়গায় উঠে এসেছে। বাবা, মা, ঠাকুরদা, ঠাকুরমা, ইঞ্জিনিয়ার কাকুর মৃত্যু, পিসিমাদের জীবন সম্পর্কীয় ধারণা স্বপ্নময় চক্রবর্তী লেখার জগতকে পরিত্যাগ করতে পারেননি। সে কথা তিনি বহু জায়গায় স্বীকার করেছেন। মায়ের সঙ্গে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর খুব বেশি নাড়ির টান রয়েছে। ফলে লেখার জগতে মায়ের দুঃখ-কষ্ট বারবার চলে এসেছে। সংসার জীবনে স্বপ্নময় চক্রবর্তী যাকে বহুবার অশ্রুপাত করতে দেখেছেন। ঠাকুরমার কাছ থেকে বহুবার গঞ্জনা সহ্য করা লক্ষ করেছেন। মা সে সব কষ্ট গুণগুণ করে গান গাইতে গাইতে ভুলে যেতেন। কিন্তু স্বপ্নময় চক্রবর্তী ভুলে যাননি মায়ের না বলতে পারা কষ্টগুলি। ১৯৭৭ সালে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর মা মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে মারা যান। তখন যন্ত্রণার কথা তিনি সাহিত্যের পাতায় ফুটিয়ে তোলেন সহানুভূতির সঙ্গে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

> *"মা বা মায়ের মতন যারা, যারা নিজেদের কথা বলতে পারে না, উশখুশ করতে থাকা ওইসব দুঃখ কথা বলতে ইচ্ছে হতে লাগল আমার। 'শকুন' গল্পের চালওয়ালি আলোমণির চোখে তো আমার মায়েরই চোখের জল। 'নকশিকাঁথার' মতির শরীরে আমার মা পুড়ে যান। 'শর্ষে ছোলা-ময়দা-আটা' গল্পে পরাণের মা যখন পরাণের কড়ে আঙুল কামড়ে দেয়, পরানের কানে কানে বলে খোশমার নেকির বালিশ ফতেমার মাথায়, মায়ের নিঃশ্বাসের গন্ধ পাই। 'দুলাল চাঁদ' গল্পের ময়নামতি, 'রক্ত' গল্পের জবা— এরকম দুঃখী মেয়েদের মধ্যে রয়ে যান আমার মা।"*[১২]

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর পরিবার পূর্ব বাংলা থেকে আসা রিফিউজি পরিবার। স্বপ্নময় কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু পারিবারিক পরিমণ্ডলে পূর্ব বাংলার স্মৃতি জড়িত চিত্র তিনি লক্ষ করেছেন। ঠাকুরমা, ঠাকুরদা প্রত্যেকেই দেশের জন্য মন কেমন করা মানুষ। কথায় কথায় তাদের স্মৃতিচারণার পরিবেশ স্বপ্নময় চক্রবর্তীর বোধকে পরিপুষ্টি দান করেছে। প্রথম উপন্যাস লেখার সময় পারিবারিক পরিমণ্ডলের চিত্র এবং অভিজ্ঞতা দু'টোই কাজ করেছে। একটি উদ্বাস্তু পরিবারে জীবন যন্ত্রণার চিত্র যেন 'শেকড় ছেঁড়া' উপন্যাসের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ। 'হেমকান্ত' যেন স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ঠাকুরদাদার চরিত্রকে মনে করিয়ে দেয়। পারিপার্শ্বিক জীবন এবং ব্যক্তিগত পরিসরের জীবন স্বপ্নময় চক্রবর্তীর সাহিত্য জীবনের সঙ্গী হয়ে পাঠকের সামনে ভিন্ন জীবন জিজ্ঞাসার পাঠ নিয়ে উপস্থিত হয়। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, ডায়ারিধর্মী রচনা ছাড়াও স্বপ্নময় চক্রবর্তী দুটি ইংরেজি গ্রন্থ রচনা করেন।

যথাক্রমে— 'The girl who wished to be alluring and other stories' এবং 'Tampa and the Sparrows'। 'মনো মন্ত্র নমো ধর্ম' নামে স্বপ্নময় চক্রবর্তী একটি নাটকও রচনা করেন। সারা জীবন ধরে সাহিত্য সাধনায় ব্রতী এই মানুষটির সাহিত্যিক হয়ে ওঠার প্রবল ইচ্ছা তাঁর লেখাকে বলিষ্ঠতা দান করেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অক্লান্ত পরিশ্রমের সঙ্গে মানুষটি তাঁর কলমকে কখনো বিশ্রাম দেন না। নিজে সময় ব্যবহার করার জন্য পড়াশুনো করেন এবং লেখেন। পাঠকের দরবারে কঠোর পরিশ্রমী বিশ্লেষক এক লেখক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর রচনায় জীবন কীভাবে বহু মাত্রায় ধরা দেয় তা আমরা বুঝতে পারি। ফলে কথাসাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী তাঁর রচনার সম্ভারকে আরও সমৃদ্ধ করবেন এটুকু আশা করাই যায়।

তথ্যসূত্র :

১. 'জীবন ভ্রমণ', স্বপ্নময় চক্রবর্তী, 'পথ সাহিত্য পত্রিকা', মনোরঞ্জন সরদার (সম্পাদক), উকিল পাড়া, পঞ্চাননতলা রোড, বারুইপুর, কলকাতা-৭০০১৪৪, একাদশ বর্ষ, জুলাই-২০১৮, পৃ. ২০।

২. 'শ্রেষ্ঠগল্প', স্বপ্নময় চক্রবর্তী, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৩, পৃ. ৭।

৩. 'আমার কথা', স্বপ্নময় চক্রবর্তী, 'কালের কষ্ঠিপাথর' (পত্রিকা), অমরেন্দ্র চক্রবর্তী (সম্পাদক), স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী, প্রা:লি:, ২৯/১এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-১৯, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৭ জুলাই ২০১২, পৃ. ৬২।

৪. 'যৌনশিক্ষা : একটি অভিজ্ঞতার বর্ণনা', স্বপ্নময় চক্রবর্তী, 'আলাপ বিলাপ', কোরক প্রকাশন, পো: দেশবন্ধুনগর ইএ১/৮ বাগুইআটি, খালধার কলকাতা-৫৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ১৭৭।

৫. 'গল্পের গ্রীনরুম', স্বপ্নময় চক্রবর্তী ,'আলাপ বিলাপ', কোরক প্রকাশন, পো: দেশবন্ধুনগর ইএ১/৮ বাগুইআটি, খালধার, কলকাতা-৫৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ৬৭-৬৮।

৬. 'আড্ডা : ব্যক্তিগত কথা', স্বপ্নময় চক্রবর্তী , 'ভাণ্ডার' (পত্রিকা), লালবাহাদুর কৈরালা (সম্পাদক), প্রকাশনা— পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন, ২৩ এ, নেতাজি সুভাষ রোড (৮ ম তল), শারদীয় সংখ্যা, ১৪২২, প্রথম প্রকাশ -১৩২৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫০।

৭. 'ছোটগল্পের প্রতিবেদন', তপোধীর ভট্টাচার্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট,

কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা, ২০১১, পৃ. ১৬১।

৮. ‘বাঙালির অশ্লীলতাবোধ’, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, ‘আলাপ বিলাপ’, কোরক প্রকাশন, পো: দেশবন্ধুনগর ইএ১/৮ বাগুইআটি, খালধার কলকাতা-৫৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ১৩৮।

৯. ‘স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর: ব্যক্তিগত কথা’,স্বপ্নময় চক্রবর্তী, ‘আলাপ বিলাপ’, কোরক প্রকাশন, পো: দেশবন্ধুনগর ইএ১/৮ বাগুইআটি, খালধার কলকাতা-৫৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ২১৫।

১০. ‘তৃতীয়া প্রকৃতি অর্থ বৃহন্নলা কথা’, কয়েকটি সাক্ষাৎকার, ‘চন্দ্রগ্রহণ’ (পত্রিকা), প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, বরদাকান্ত রোড, দমদম, কলকাতা-৩০, শারদ সংকলন, ২২ বর্ষ, ২০১৪, পৃ. ২৮২।

১১. ‘যৌনশিক্ষা : একটি অভিজ্ঞতার বর্ণনা’, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, ‘আলাপ বিলাপ’, কোরক প্রকাশন, পো: দেশবন্ধুনগর ইএ১/৮ বাগুইআটি, খালধার কলকাতা-৫৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ১৮১।

১২. ‘জীবন ভ্রমণ’, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, ‘পথ সাহিত্য পত্রিকা’, মনোরঞ্জন সরদার (সম্পাদক), উকিল পাড়া, পঞ্চাননতলা রোড, বারুইপুর, কলকাতা-৭০০১৪৪, একাদশ বর্ষ, জুলাই ২০১৮, পৃ.১১।